বৈষ্ণব পদাবলী

ডঃ তাপস অধিকারী

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামপুর কলেজ

গৌরচন্দ্রিকা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ ধারা হল বৈষ্ণব পদাবলী। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা মাহাত্ম্য বর্ণনাই বৈষ্ণব পদাবলীর মূল উদ্দেশ্য। এই পদাবলী বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী লোকেদের কাছে সাধণ সঙ্গীত হিসাবে গণ্য। আর বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষেত্রে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন গৌরাঙ্গ বা চৈতন্যদেব। ভক্তবৈষ্ণবেরা তাঁকে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ বলে মনে করতেন। তারা মনে করতেন গৌরাঙ্গ ছিলেন বহিরঙ্গে রাধা, আর অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ। তাই বলা হয়েছে—

''রাধাকৃষ্ণ একাত্মা দুই দেহ ধরি।
অনন্য বিলয়ে রস আস্বাদন করি।।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই।।''

এই কারণেই ভক্তবৈষ্ণবদের কাছে চৈতন্য দেব অবতার রূপে পূজিত। তাই বৈষ্ণবকবিরা রাধাকৃষ্ণের পাশাপাশি চৈতন্যদেবকে নিয়েও অনেকগুলি পদ রচনা করেছিলেন। এই পদগুলিকে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ বলা হয়।

এদিকে 'গৌরচন্দ্রিকা' শব্দের অর্থ 'উপক্রমণিকা', 'ভূমিকা' অথবা 'আরম্ভ'। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে শব্দটির অন্যভাবে তাৎপর্য গ্রহণ করা হয়। 'চন্দ্রিকা' শব্দের অর্থ 'জোৎস্না কিরণ' ধরলে এর একটি অর্থ পাওয়া যায়। চন্দ্রের কিরণ যেমন অন্ধকার পৃথিবী আলোকিত করে তেমনি চৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনাগীতিও রাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গে আলোক পাত করে। এছাড়াও এই সঙ্গীতে শ্রোতা ও গায়কের মালিণ্যও তিরোহিত হয়। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর মূল পালাকীর্তনের পূর্বে ভূমিকা হিসাবে যে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ গাওয়া হয় এবং যার মাধ্যমে মূল পালাকীর্তনের বিষয় সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায় তাকেই গৌরচন্দ্রিকা বলে।

বৈষ্ণব পদাবলী মূলত লেখা হয়েছিল কীর্তনগানের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে জনমানসে ছড়িয়ে দিয়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে উদ্দেশ্যে। বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ক্রমবিকাশের ধারাকে পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান, কলহন্তরিতা, মাথুর, ভাবসম্মেলন প্রভৃতি ভাগে ভাগ করেছেন। কীর্তনগানের আসরে এই সমস্ত পর্যায়ের কোন একটিকে গ্রহণ করে পালা হিসাবে গাওয়া হত। তবে মূল পালাকীর্তনের পূর্বে অনুরূপ ভাবমূলক গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ ভূমিকা হিসাবে গাওয়া হত। ভূমিকার এই পদটি শুনেই দর্শকরা বুঝতেন যে, মূল পালাকীর্তনের বিষয়বস্তু কি হবে। এরূপ মূল পালাকীর্তনের সাথে ভাব সাদৃশ্যমূলক যে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি মূল পালাকীর্তনের পূর্বে ভূমিকা হিসাবে গাওয়া হত সেগুলিকেই গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়। যেমন অনেক সময় কীর্তন গানের আসরে গাওয়া হয়—

''আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব।।''

যদি মূল পালাকীর্তনের পুর্বে এই পদটি গাওয়া হয় তাহলে দর্শকেরা সহজেই বুঝে যায় সেদিন মূল পালাকীর্তনের পদ হিসাবে পূর্বরাগের পদ গাওয়া হবে। কারণ এই পদটিতে গৌরাঙ্গের কৃষ্ণচিন্তা বিভোর রূপের প্রকাশ ঘটেছে জন্য তিনি 'করতলে করই বয়ন অবলম্ব'। আর এরূপ চিন্তার জন্য তার মধ্যে অস্থিরতা জেগে উঠেছে। রাধার পূর্বরাগের ফলেও রাধার মধ্যে এরূপ ভাব বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছিল। অনুরূপভাবে মূল পালাকীর্তনের পূর্বে গৌরাঙ্গদেবকে নিয়ে লেখা—

''হেদেরে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরা চাঁদেরে ফেরাও।।''

এই পদটি গাওয়া হলে দর্শকেরা সহজে বুঝে যান সেদিনের পালাকীর্তনের বিষয় হল মাথুর। কারণ শ্রীকৃষ্ণ কংস বধের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরায় চলে গেলে বৃন্দাবনবাসীরও একই অবস্থা হয়েছিল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে উপরের পদগুলি গৌরচন্দ্রিকার পদ।

বৈষ্ণব পদাবলীর গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি গৌরাঙ্গ অর্থাৎ চৈতন্যদেবকে নিয়ে লেখা হলেও সমস্ত গৌরাঙ্গবিষয়ক পদই গৌরচন্দ্রিকা নয়। আর গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলির মধ্যে যে পদগুলি মূল পালাকীর্তনের

আগে ভূমিকা হিসাবে গাওয়া হয় সেগুলিই হল গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক পদ। অর্থাৎ গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ হল চৈতন্যদেবকে নিয়ে লেখা যে কোন পদ, আর গৌরচন্দ্রিকা হল চৈতন্যদেবকে নিয়ে লেখা অথচ মূল পালাকীর্তনের পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ গাওয়া পদগুলি।

সামগ্রিক বৈষ্ণব পদাবলীতে দু'টি লীলার কথা বলা হয়— নবদ্বীপ লীলা ও বৃন্দাবন লীলা। নবদ্বীপ লীলা হল গৌরাঙ্গ অর্থাৎ চৈতন্যদেব বিষয়ক, আর বৃন্দাবন লীলা হল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। বৃন্দাবন লীলাই বৈষ্ণব পদাবলীর মূল। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবরা মনে করেন এই মূল বৃন্দাবন লীলা বুঝবার জন্য নবদ্বীপ লীলার প্রয়োজন আছে। বৈষ্ণব কবি বাসুদেব ঘোষ (কারও মতে নরহরি সরকার) লিখেছেন—

''যদি গৌরাঙ্গ না হইত কী মেনে হইত কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতে জানাত কে।।''

তাই চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর থেকেই অনেক বৈষ্ণব কবি চৈতন্যদেবকে নিয়ে অজস্র পদ রচনা করেছেন। এই পদকর্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন গোবিন্দ দাস।

গোবিন্দ দাস চৈতন্য পরবর্তীযুগের কবি হলেও চৈতন্য সমসাময়িক ব্যক্তিদের কাছে থেকে ও চৈতন্য জীবনি গ্রন্থ পাঠ করে চৈতন্যদেব অর্থাৎ গৌরাঙ্গদেব সম্পর্কে যা জেনেছিলেন তার উপর ভিত্তি করেই তিনি একের পর এক গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে অনেক পদই গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে গাওয়া হয়। গোবিন্দদাসের লেখা—

''চম্পক শোন কুসুম কণকাচল
জিতল গৌর-তনু-লাবনে রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগ-মনমোহন ভাল নিয়ে।।''

এই পদটিতে চৈতন্যদেবের দেহ লাবন্যের বর্ণনা আছে। গোবিন্দদাসের আর একটি পদ—

''নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব।।''

এখানে তিনি গৌরাঙ্গদেবের চোখ দু'টিকে মেঘের সাথে তুলনা করেছেন এবং মেঘ থেকে যেমন বৃষ্টি ধারা বর্ষিত হয় গৌরাঙ্গদেবের চোখ দু'টি থেকে যেন অনুরূপ অশ্রুপাত হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের ফলে বৃক্ষে বৃক্ষে যেমন মুকুল দেখা যায় গৌরাঙ্গদেবের দেহরূপ বৃক্ষ থেকেও ঠিক তেমনি ভাবরূপ মুকুল দেখা দিয়েছে। আর তিনি অবিরত ভাবে মানুষের মধ্যে প্রেম বিতড়ন করলেও যেহেতু গোবিন্দ দাস তাঁর সাক্ষাৎ পাননি, তাই তিনি নিজেকে বঞ্চিত ভেবেছেন—

''অবিরত প্রেম- রতনফল বিতড়নে
অখিল মনোরথ পুর।
তা কর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দ দাস রহু দূর।।''

এভাবে গোবিন্দ দাস তাঁর গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলির মাধ্যমে গৌরাঙ্গদেবের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পন করেছেন।

চৈতন্যোত্তর যুগের অপর বৈষ্ণবকবি জ্ঞানদাসও গৌরাঙ্গদেবকে নিয়ে বেশ কয়েকটি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করেছেন। জ্ঞানদাসের গৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণচিন্তায় এতটাই মগ্ন ছিল যে, 'চলিতে না পারে ক্ষণে পরে মূরছিয়া'। কবি পরমানন্দও নানা বস্তুর তুলনায় চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করে বলেছেন—

''গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়ারে
রতন হইল কতজনা।''

এভাবে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলিতে গৌরাঙ্গদেবকে কখনও অকলঙ্ক পূর্ণচাঁদ, কখনও কল্পতরু প্রভৃতির সাথে তূলনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন কবি গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণে, নবদ্বীপ ত্যাগে শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়াসহ নবদ্বীপবাসীর দুর্দশার ছবি এঁকেছেন। ফলে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের ধারাটি সমৃদ্ধ হয়েছে।

পূর্বরাগ ও অনুরাগ

বৈষ্ণব পদাবলী মূলত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা মাহাত্ম্যসূচক পদের সমষ্টি। বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমজীবনের ক্রমবিকাশের ধারাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে পদ রচনা করেছেন। এরমধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমজীবনের প্রথম পর্যায় হল পূর্বরাগ। বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের আকর গ্রন্থ 'উজ্জ্বল নীলমনি'তে পূর্বরাগের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

''রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।
তয়োরুম্বীলতি প্রাজ্ঞৈ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে।।''

অর্থাৎ মিলনের পূর্বে নায়ক নায়িকার মনে দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদির ফলে যে আস্বাদময়ী অনুরক্তি জন্মে তারই নাম পূর্বরাগ।

নায়ক নায়িকার দর্শন সক্ষাতে, ছবির মাধ্যমে বা স্বপ্নের মধ্যে ঘটতে পারে। আবার তারা পরস্পরের সাথে সখী, দূত বা অন্য কারও মাধ্যমে জানতে পারেন। এছাড়াও নাম শুনে, বংশীধ্বনির প্রভাবে বা অন্যকোন গুনের কারনেও অনুরোক্তি জন্মাতে পারে। ফলে নায়ক-নায়িকারা পরস্পরকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। এরফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় নানা অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করা যায়। যে পদে নায়ক-নায়িকার এই অস্বাভাবিকত্বের বর্ণনা করা হয় সেগুলিকেই পূর্বরাগ বিষয়ক পদ বলে। পূর্বরাগের ফলে দশটি দশা দেখা যেতে পারে। যেমন— লালসা, উদ্বেগ, জাগর্যা, তানব, জড়িমা, বৈরাগ্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের পর তাদের হৃদয়ে গভীর প্রেমের সঞ্চার ঘটলে তাকে অনুরাগ বলে। 'অনু' অর্থাৎ পরে; 'রাগ' অর্থাৎ আকর্ষণ— অনুরাগ হল পরবর্তী তীব্র আকর্ষণ। 'উজ্জ্বল নীলমনি' গ্রন্থে অনুরাগ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় যে , নায়ক-নায়িকার মাধুর্য বা মধুরিমা মূহুর্মূহু অনুভূত হলে সে মধুরিমাকে আবার অনুভূত করার তীব্র তৃষ্ণাকে অনুরাগ বলে। পূর্বরাগ ও অনুরাগের মূল পার্থক্য হল আবস্থাগত। পূর্বরাগ হল প্রথম প্রেমাকর্ষণ; নায়ক-নায়িকার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পূর্বের অনুরক্তি, আর অনুরাগ হল তাদের সাক্ষ্যৎ ও পরিচয়ের পরবর্তী গভীর প্রেম।

বৈষ্ণব কবিগণ পূর্বরাগ পর্যায়ের পদ রচনায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাক্‌চৈতন্যযুগ এবং চৈতন্যোত্তর যুগের বেশিরভাগ কবি পূর্বরাগ বিষয়ক পদ রচনা করলেও কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, গোবিন্দদাস এবং জ্ঞানদাস। এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন চন্ডীদাস।

চন্ডীদাস ছিলেন প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবি। চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলীতে যে ভগবত মহিমা আরোপিত হয়েছিল তার পূর্বেই তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর চর্চা করে গেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক বাস্তব নরনারীর সম্পর্কের মতই বর্ণিত হয়েছে। তিনি পূর্বরাগ পর্যায়ে যত সহজভাবে গভীর কথা বলেছেন তা আর কারও রচনায় পাওয়া যায়নি। চন্ডীদাসের রাধা প্রথম থেকেই কৃষ্ণপ্রেমে পাগলীনি। তাই কবি বলেছেন—

''রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।।''

এই রাধা কৃষ্ণপ্রেমে এতটাই আকুল যে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তার মধ্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষার জন্ম নিয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি কৃষ্ণমিলনের অনুকূল নয়। তাই কৃষ্ণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তুর প্রতি তার আকর্ষণ—

''সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমত যোগিনি পারা।।''

কৃষ্ণের সঙ্গে বর্ণ সাদৃশ্য আছে এমন বস্তু অর্থাৎ মেঘ, নিজের চুল, ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ্য প্রভৃতির দিকে রাধা একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন।

শুধু কৃষ্ণের বর্ণের প্রতি নয়; কৃষ্ণের নামের প্রতিও রাধার অনুরোক্তি জন্মেছে। কৃষ্ণের নাম শুনে অভিভূত চন্ডীদাসের রাধা বলেছেন—

''সই কেবা শোনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকূল করিল মোর প্রাণ।।''

এই শ্যামনাম রাধার কাছে এতই প্রিয় যে সেই নাম জপ করতে করতে রাধার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে পড়ে। রাধা বুঝতে পারেনা যে, নামশুনেই তার এমন অবস্থা হলে অঙ্গের পরশে কি হবে। তাই তিনি বলেছেন—

''নাম পরতাপে যার ঐ ছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতি-ধরম কৈছে রয়।''

কৃষ্ণের জন্য রাধার হৃদয়ের এই ব্যকুলতাকে চন্ডীদাস আরও যথাযথ করার জন্য জানিয়েছেন যে, রাধা—

''ঘরের বাহিরে দন্ডে শতবার।
তিলে তিলে আইসে যায়।।''

রাধা কৃষ্ণের জন্য এতই আকূল যে তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা এলেও কোন ভয়-ভীতির জন্ম নেয়নি। তাই চন্ডীদাস জানিয়েছেন তিনি এমন পীরিতি কখনও দেখেন নি এবং ত্রিভুবনেও এরকম কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত চন্ডীদাসের রাধাকে কৃষ্ণের প্রতি পূর্বরাগ উন্মাদিনী করে তুলেছে এবং তার প্রেমচিন্তা দেহ থেকে বিদেহী হয়ে উঠেছে। রাধা কৃষ্ণচিন্তায় এতটাই মোহিত হয়ে পড়েছেন যে তিনি সর্বদাই কৃষ্ণকে দেখতে পান—

''পুলকে আকূল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি।''

চন্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণচিন্তায় এতটাই আকূল যে, কানুর নামকারী লোকের পা ধরতেও প্রস্তুত।

চন্ডীদাস ছাড়াও প্রাক্‌চৈতন্যযুগের অপর কবি বিদ্যাপতিও বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্টমানের পূর্বরাগের পদ রচনা করেছেন। তিনি কিশোরী রাধাকে ধীরে ধীরে যুবতী নায়িকায় পরিণত করেছেন জন্য তাঁর রাধার মধ্যে সামাজিক নানা ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যাপতির রাধার মধ্যে লৌকিক সমাজের লজ্জা, ভয় আছে জন্য তিনি অকুণ্ঠ্যভাবে প্রেমের প্রকাশ না করে ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। তবে বিদ্যাপতির রাধাও কৃষ্ণপ্রেমে এতটাই আকূল হয়ে পড়েছেন যে, কৃষ্ণকে তাঁর শরীরের নানা অঙ্গের সাথে তূলনা করেছেন—

''হাথক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মূখক তাম্বুল।।''
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার।।''

চন্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস রাধার পূর্বরাগের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রধানত রূপজ আকর্ষণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গোবিন্দদাসও এই রূপজ আকর্ষণের কথা বলেছেন। তবে তিনি রাধার পূর্বরাগ বিষয়ক পদ রচনার পাশাপাশি শ্রীকৃষ্ণেরও পূর্বরাগ বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। গোবিন্দদাসের কৃষ্ণের মনে হয়েছে—

''যাঁহা যাঁহা নিকষয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাহা তাহা নিকষয়ে চমকময় হোতি।।''

এইভাবে বৈষ্ণব কবিরা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের প্রথম পর্যায় অবলম্বন করে পদ রচনা করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে পূর্বরাগ বিষয়ক পদে কবি চন্ডীদাস যত সহজে এবং সাবলীলভাবে পদ রচনা করেছেন অন্য কোন বৈষ্ণব কবি তা পারেন নি। চন্ডীদাস রাধার জীবনের সামগ্রিক রূপকেই যেন স্পষ্ট করে তুলেছেন। তাই চন্ডীদাস হলেন পূর্বরাগ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি।

অভিসার

বৈষ্ণব পদাবলী মূলত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা মাহাত্ম্য সূচক পদের সমষ্টি। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ক্রমবিকাশের ধারাকে কতকগুলি পর্যায়ে ভাগ করে পদ রচনা করেছেন। যেমন— পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান, কলহান্তরিতা, প্রেমবৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাব সম্মেলন প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের কাছে সম্ভবত সর্বাধিক প্রিয় পর্যায় হল অভিসার। নায়ক বা নায়িকার সাথে নায়িকা বা নায়কের মিলনের উদ্দেশ্যে কোন পূর্ব নির্দিষ্ট স্থান অভিমুখে যাত্রাকে অভিসার বলে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে ত্রয়োদশ প্রকার নায়ক-নায়িকার কথা বলা হয়েছে, এদের আটটি অবস্থা যার মধ্যে প্রথমটি হল অভিসারিকা। 'উজ্জ্বল নীলমনি' গ্রন্থে অভিসারিকার লক্ষণে বলা হয়েছে— যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করান বা নিজে অভিসার করেন তাকেই বলে অভিসারিকা।

বৈষ্ণব পদাবলীতে নায়কের তুলনায় নায়িকা রাধার অভিসারের পদের সংখ্যাই বেশি; আর যে পর্যায়ে অভিসারের স্থান তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পূর্বরাগ ও অনুরাগের মধ্য দিয়ে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম সম্পর্ক সবে সুদৃঢ় হতে চলেছে, পাশাপাশি রাধা জানেন না কখন, কোন অবস্থায় এবং কোথায় কৃষ্ণ তাকে মিলনের জন্য আহ্বান করবেন। তাই তিনি সর্বাবস্থায় কৃষ্ণের সাথে মিলনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার নানা প্রকার অভিসারের কথা আছে। যেমন— জ্যোৎস্নাভিসার, তিমিরাভিসার, বর্ষাভিসার, দিবাভিসার প্রভৃতি।

বৈষ্ণব কবিগণ অভিসারকে সমগ্র লীলাতত্ত্বের মেরুদন্ড বলে গ্রহণ করেছেন। এখানে রাধা-কৃষ্ণের অভিসারের মধ্য দিয়ে ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক যেন রূপকচ্ছলে প্রকাশিত। তাই ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে অভিসার হচ্ছে 'ভগবৎ অন্বেষণ'। মণীষি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিসারকে বলেছেন "Devine call of Spritual guest." বৈষ্ণব কবিগণ ভগবৎ অন্বেষণে আপ্লুত হয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে অভিসার বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রায় সমস্ত কবি অভিসার বিষয়ক পদ রচনা করলেও সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন চৈতন্য পরবর্তীযুগের কবি গোবিন্দদাস।

অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠকবি গোবিন্দদাস তাঁর অভিসারিকা রাধাকে সর্বাবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছেন। এরূপ প্রস্তুতির মধ্য দিয়েও রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের গাঢ়তা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমের জন্য কোমল গৃহবধুর মধ্যদিয়ে সাহসিকা রূপের প্রকাশ ঘটেছিল। গোবিন্দদাসের রাধা কৃষ্ণের অভিসারে যাবার জন্য নানারূপ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। সেই প্রস্তুতি বর্ণনায় গোবিন্দদাস লিখেছেন—

''কন্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতোহি অঙ্গুলি চাপি।।''

রাধাকে কন্টকাকীর্ণ পথ চলতে যেন কোন কষ্ট পেতে না হয়, পাশাপাশি কর্দমাক্ত পথেও তিনি যেন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারেন তারই প্রস্তুতি তিনি গ্রহণ করেছেন। এই পদ থেকে আরও জানা যায় রাধা দু'হাতে চোখ ঢেকে পথ চলা অভ্যেস করেছেন, যাতে অন্ধকারে পথ চলতে তাঁর কোন কষ্ট না হয়। আর পথে
সাপের ভয় থাকতে পারে জন্য রাধা 'ভুজগ গুরু'র কাছে মন্ত্র শিক্ষা করেছেন। এজন্য তাঁকে হাতের কঙ্ক বন্ধক দিতে হয়েছে—

''কর-কঙ্কন-পণ ফনি মুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে''

গোবিন্দদাস রাধার অভিসার প্রস্তুতির বর্ণনায় যেমন নিপুন চিত্র অঙ্কন করেছেন, তেমনি অভিসারিকা রাধার বর্ণনাতেও নৈপুন্যের পরিচয় দিয়েছেন। অভিসারিকা রাধার সামনে প্রচুর বাঁধাবিপত্তি, ঘরের কঠিন দরজা ভেদ করে পথে নেমেও তাঁর শান্তি নেই। তাই গোবিন্দদাস লিখেছেন—

''মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তহি অতি দুরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নীচল।।''

অর্থাৎ প্রবল বৃষ্টিতে পথ চলা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘন ঘন বজ্রপাতে, বিদ্যুতের চমকে প্রকৃতি জগতের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। রাধাকে এরূপ ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক পরিবেশ অগ্রাহ্য করে অভিসারে যেতে হয়। রাধারব কৃষ্ণপ্রেমে এতই নিষ্ঠা যে প্রেমের জন্য প্রাণ বলিদান দিতেও তিনি রাজী; তাই দৈহিক কোন কষ্টকে তাঁর কিছুই মনে হয়না। কৃষ্ণ সুরধনি নদীর ওপারে থাকেন। রাধাকে অতি কষ্টে ভয়ঙ্কর প্রকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে নদী পেরিয়ে অভিসারে যেতে হয়। গোবিন্দদাসের রাধা এসব কিছুকে অগ্রাহ্য করে বলেছেন—

''কুল মরিয়াদ কপাট উদ্‌ঘাটলুঁ
তাহে-কি-কাঠ-কি বাঁধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু সঞে পঙারলুঁ
তাহে কি তটিনি অগাধা।।''

অর্থাৎ কুলের মর্যাদা, গুরুজনদের শাসন বারণ সমস্ত কিছু রাধা খুব সহজে অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন। তাই ঘরের কাঠের দরজা তাঁকে অভিসারে বাঁধা দিতে পারেনা। আত্মমর্যাদারূপ সমুদ্র রাধা গোষ্পদের ন্যায় পার হয়ে এসেছেন, তাঁর কাছে সামান্য নদী কি এমন গভীর। কারণ—

''প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজর কি আগি।''

অর্থাৎ প্রকৃতি জগতের অশান্ত পরিবেশ অভিসারে রাধাকে ক্ষান্ত করতে পারেনি।

গোবিন্দদাসের রাধা অভিসারে কৃষ্ণের সাথে মিলনে সার্থক হয়েছেন। রাধা ভয়ংকর প্রাকৃতিক পরিবেশ অগ্রাহ্য করে ভিজতে ভিজতে কুঞ্জকুঠিরে এসে উপস্থিত হলে কৃষ্ণ নিজেই—

''আদরে আগুসারি রাই হৃদয় ধরি
জানু উপরে পুনরাখি।
নিজকর কমলে চরণ-যুগ মোছই
হেরইতে চির থির আঁখি।।''

অর্থাৎ রাধার সেবায় কৃষ্ণ নিজেই নিয়োজিত হয়েছেন এবং রাধার কষ্ট স্বীকার সার্থক হয়েছে। তাই কবি লিখেছেন—

''যা কর দরশনে সব দুখ মিটল
সই আপনে করু সেবা।''

রাধা তাঁর পথের সমস্ত বাঁধা বিপত্তির কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমার্কষণ এবং কৃষ্ণদর্শনের আশায় সমস্ত দুঃখ কষ্টকে অনায়াসে সহ্য করেছেন।

চৈতন্য পরবর্তীযুগের অপর কবি জ্ঞানদাসও বর্ষাভিসারে রাধার প্রেমের বর্ণনা দিয়েছেন। জ্ঞানদাসের রাধা গুরুজনদের শাসন বারন অগ্রাহ্য করে, পথের সমস্ত বাঁধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে প্রবল বর্ষণে ভিজতে ভিজতে সংকেত স্থান অভিমুখে ছুটে চলেছে। গোবিন্দদাসের রাধা ছিল অভিসারে এককযাত্রী, কিন্তু জ্ঞানদাসের রাধা দু'-চারজন সখিকেও সাথে নিয়েছেন। তবে গোবিন্দদাসের রাধা অভিসারে ব্যর্থ হয়ে বেদনায় বিদীর্ণ হয়েছেন।

কবি চন্ডীদাস একটি পদে কৃষ্ণের অভিসার সম্পর্কে আভাস দিয়ে এক বৃহত্তর সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। প্রবল বৃষ্টিপাতের সংকেত স্থানে রাধার পৌছাতে দেরি হলে কৃষ্ণ নিজেই ভিজতে ভিজতে রাধার আঙ্গিনায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তা দেখে রাধা বলেছেন—

''এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বটে।
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিঝে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।''

রাধা এ অবস্থায় দুঃখের সাথে কৃষ্ণের কাছে তাঁর বিলম্বের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন এবং এখানে আসতে কৃষ্ণকে নানা কষ্ট পেতে হয়েছে মনে করে তিনি অনুতপ্ত হয়েছেন। তবে কৃষ্ণের এই উপস্থিতি রাধার কাছে পূণ্যফলরূপে বিবেচিত হয়েছে। রাধা বলেছে—

''কোন পূণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে।''

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পদটির অন্তর্নিহিত ভাবসত্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ভগবান কখনোই ভক্তকে ভুলে থাকতে পারেন না, সংসার জীবনের নানা বিধ চক্রে মানুষ হয়ত ভগবানকে ভুলে যেতে পারেন কিন্তু ভগবান অপেক্ষা করেন এবং যথাসময়ে কষ্ট স্বীকার করে এসে উপস্থিত হন। চন্ডীদাসের এই পদটির মধ্যে ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক নিহিত আছে জন্য বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে এই পদটি অত্যন্ত প্রিয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কের ক্ষেত্রে অভিসারের মূল্য অপরিসীম। অভিসারের পরিচয়কে অবলম্বন করে রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্ক পরবর্তী পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে। আবার ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে অভিসার হচ্ছে 'পরমাত্মা'র সঙ্গে মিলিত হবার জন্য 'জীবাত্মা'র অভিসার। এই মিলনে সব দুঃখের অবসান। এই অভিসার পর্যায়ের পদ রচনায় পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ভাবে রাধার অভিসারের প্রস্তুতি থেকে অভিসার ও মিলন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা সার্থকভাবে মনস্তত্বসম্মত উপায়ে বর্ননা করেছেন কবি গোবিন্দদাস। তাই নিঃসন্দেহে তিনি অভিসার পর্যায়ের পদ রচনায় শ্রেষ্ঠ।

আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্য

বৈষ্ণব পদাবলী হল মূলত রাধাকৃষ্ণের প্রেমভাব মূলক পদের সমষ্টি। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমজীবনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে এখানে পদ রচনা করেছেন। এই পর্যায়গুলির মধ্যে অন্যতম দু'টি পর্যায় হল আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্য। এর মধ্যে আক্ষেপানুরাগে সুতীব্র কৃষ্ণবিরহে কাতর রাধার আক্ষেপোক্তির মধ্য দিয়ে হৃদয়ের গভীর অনুরাগ ঝড়ে পড়েছে। আক্ষেপানুরাগের প্রধান বৈশিষ্ট্য অনুযোগ। রাধা কৃষ্ণকে দেহ, মন, প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন, তাঁর জন্য ঘর সংসার ত্যাগ করেছেন, মাথায় তুলে নিয়েছেন কলংকের ডালি অথচ সেই কৃষ্ণকে যেভাবে তিনি পেতে চেয়েছিলেন, সেভাবে পাচ্ছেন না, তাই রাধার দুঃখের শেষ নেই এবং এই দুঃখ তিনি আক্ষেপোক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর যে সকল পদে রাধার এসকল আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হল আক্ষেপানুরাগের পদ। রাধার এই আক্ষেপ কখনো কৃষ্ণের প্রতি, কখনো নিজের প্রতি আবার কখনওবা সখী, দূতি, মুরলী, বিধাতা প্রমুখের প্রতি ঝরে পড়েছে।

প্রেমবৈচিত্ত্য হল প্রেমের অভিনব এক রসাস্বাদন পদ্ধতি। এর মধ্যে একই সঙ্গে রয়ছে মিলনের আনন্দ ও বিরহের ক্রন্দন। রূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বল নীলমনি' গ্রন্থে বলেছেন—

''প্রিয়ষ্য সন্নিকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষ্যাধিয়াতিঃ স্যাৎ প্রেমবৈচিত্ত্য মিষ্যতে।।''

অর্থাৎ প্রিয়ের কাছে প্রেমের স্বভাবে থাকতে হয়, প্রেমবৈচিত্ত্য হেতুভাবে বিরহের আবেশ সৃষ্টি করতে হয়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে প্রেমবৈচিত্ত্য হচ্ছে নায়ক-নায়িকার মিলনের সময় বিচ্ছেদের আশঙ্কা। আসলে রাধা দীর্ঘ কষ্ট ভোগ করার পর কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলে তার মধ্যে যে বিচ্ছেদের ভাবনার উদয় হয়েছে সেই ভাবনাকে যে সকল পদে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি হল প্রেমবৈচিত্ত্যের পদ।

আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্য দু'টি পর্যায়ের ক্ষেত্রেই বিরহের প্রসঙ্গ আছে জন্য জন্য অনেকেই এই পর্যায় দু'টিকে একসঙ্গে ধরতে চান। তবে আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্য এক জিনিস নয়— এই দু'টি

পর্যায়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। আক্ষেপানুরাগ হল কৃষ্ণের সাথে মিলিত হতে না পারার জন্য বিরহজনিত আক্ষেপ, আর প্রেমবৈচিত্ত্য হল কৃষ্ণের সাথে মিলিত হবার পর আবার বিচ্ছিন্ন হতে হবে এই শঙ্কাজনিত আক্ষেপ। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্য দু'টি পৃথক পর্যায়।

আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্য অবলম্বনে অনেক কবিই পদ রচনা করেছেন। এই সকল পদের মধ্যে রাধার হৃদয়ের নানা বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে। অধিকাংশ পদের মধ্যে প্রেমের বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি আছে আক্ষেপের বৈচিত্র্য। রাধা ভালোমত জানেন যে, কৃষ্ণ একান্তভাবে তারই প্রাণপ্রিয়, তথাপি তার সঙ্গে কল্পিত বিচ্ছেদ কল্পনা করে নিয়ে আক্ষেপের মধ্য দিয়ে রাধা যেন তার মনযন্ত্রনাকেই প্রকাশ করেছেন। তাই রাধার আক্ষেপ শুধু কৃষ্ণের প্রতি নয়; যা কিছু কৃষ্ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার সকলের প্রতি রাধা অনুযোগ প্রকাশ করে মনের জ্বালা দূর করার প্রয়াস করেছেন। বংশী কৃষ্ণের প্রিয়, তাই রাধা বংশীর উদ্দেশ্যে বলেছেন—

''খলের বদনে থাক নামধরি সদা ডাক
গুরুজনা করে অপযশ।
খল হয় যেই জনা সেকী ছাড়ে খলপনা
তুমি কেন হও তার বশ।।''

রাধা আক্ষেপানুরাগবশত প্রতিদ্বন্দ্বীনীর উদ্দেশ্যেও আক্ষেপ করেছেন।

অনেক কবি আক্ষেপানুরাগের পদ রচনা করলেও চন্ডীদাস এ পর্যায়ে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর একটি পদে রাধার আক্ষেপোক্তির মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে হৃদয়ের করুণ ক্রন্দন—

''ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।।
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি।।''

চন্ডীদাস আর একটি পদে রাধার কাতর হৃদয়ের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

''যত নিবারিতে চাই নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে।।
এছাড় রসনা-মোর হইলাক বামরে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে।।''

রাধা কৃষ্ণের জন্য যে বেদনায় জর্জরিত হচ্ছেন, কৃষ্ণপ্রাণে সে বেদনার তরঙ্গ আঘাত করছে কীনা রাধা তা জানেন না। তাই রাধার প্রবল আক্ষেপোক্তি—

''কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা।।''

জ্ঞানদাসের একটি পদে যেন রাধার আক্ষেপানুরাগ যেন করুণ ধারায় ঝরে পড়েছে। বড়ো আশা নিয়ে রাধা কৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলেন কিন্তু সে ভালোবাসার পরিণতি হয়েছে শোচনীয়—

''সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।''

আক্ষেপানুরাগ ছাড়াও বৈষ্ণব কবিরা প্রেমবৈচিত্ত্য বিষয়ক পদে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ পর্যায়েও যে কবির নাম সর্বাগ্রে আসে তিনি হলেন চন্ডীদাস। একটি পদে চন্ডীদাস প্রেমবৈচিত্ত্যের ভাবটি বড়ো সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন—

''দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধতিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।।''

কবি গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রমুখেরাও এরূপ প্রেমবৈচিত্ত্যের পদ রচনা করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্যের পদে বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের একটা দিককে উদ্‌ঘাটন করেছেন। ভক্তবৈষ্ণবেরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পর্যায়ের এই দিকটিকে আধ্যাত্মিক মহিমা আরোপ করলেও রসজ্ঞপাঠক আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্যের পদ থেকে যথেষ্ট রস আস্বাদন করে নেন। তাই মধ্যযুগে লেখা হলেও অনেক কাল অতিক্রম করে বৈষ্ণব পদাবলীর আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্যের পদগুলি আজও সজীব।

ভাবোল্লাস বা ভাবসম্মেলন

বৈষ্ণব পদাবলী হল রাধাকৃষ্ণের প্রেমমাহাত্ম্য সূচক পদের সমষ্টি। বৈষ্ণব কবিগণ এখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমজীবনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে তার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এই পর্যায়গুলি হল পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান, কলহান্তরিতা, মাথুর ভাবসম্মিলন প্রভৃতি। এর মধ্যে পূর্বরাগ পর্যায়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্পর্ক তৈরি হয় এবং অনুরাগ পর্যায়ের ভিতর দিয়ে অভিসার পর্যায়ে তা চরমে পৌছায়। এসময় রাধাকৃষ্ণের চিরস্থায়ী মিলন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কৃষ্ণ ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর অবতার। শুধু রাধার সঙ্গে প্রেমলীলা করার জন্য তার মর্তে আগমন ঘটেনি। কৃষ্ণের মর্ত আগমনের প্রধান হেতু ছিল মথুরারাজ অত্যাচারী কংসের হাত থেকে মর্তবাসীকে রক্ষা করা। কর্তব্যের এই টানে কৃষ্ণ একসময় রাধাকে ছেড়ে, বৃন্দাবনবাসীকে ছেড়ে মথুরা চলে যান— আর কখনও বৃন্দাবনে ফিরে আসেননি। কৃষ্ণ রাধাকে ছেড়ে চলে গেলে রাধার হৃদয় বিরহ বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে পড়ে। রাধার এই অবস্থার পরিচয় বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুর পর্যায়ের পদে আছে। বাস্তব জগতে যখন রাধা কৃষ্ণের মিলন সম্ভব হল না, তখন বৈষ্ণব কবিরা ভাবের জগতে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলন ঘটিয়ে কিছু পদ রচনা করেছেন। এই পর্যায়ের পদগুলিকে ভাবোল্লাস বা ভাবসম্মেলন পর্যায়ের পদ বলা হয়।

বৈষ্ণবতাত্ত্বিকেরা রাধাকৃষ্ণের ভাবের জগতে মিলনের একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে বাস্তব জগতের মিলনের যথেষ্ট ব্যথা, বেদনা, বিরহ, বিচ্ছেদ থাকে কিন্তু ভাবের জগতের মিলন চিরমিলন— এখানে বিরহ বা বিচ্ছেদের কোন অবকাশ নেই। তাদের মতে কৃষ্ণের দু'টি লীলা— প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা। প্রকটলীলায় কৃষ্ণ কংস বধের জন্য ও রাজত্ব করবার জন্য মথুরায় গমন করেছিলেন, আর অপ্রকট লীলায় তিনি নিত্য মন বৃন্দাবনে বিরাজিত যেখানে রাধার সাথে তার নিত্য মিলন ঘটে। ভাবসম্মেলনের একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে— বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণ হলেন ভগবানের স্বরূপ, আর রাধা হলেন মানবাত্মার স্বরূপ। এ কথা তো সত্যই মানবাত্মার ভাবনায় জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে সর্বদাই ভগবান বিরাজ করে।

ভাবসম্মেলন পর্যায়ের পদের আর একটি আলোচনাও চালু আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয়রা কখনোই ট্রাজেডিতে বিশ্বাস রাখেনি। ট্রাজেডি কথটি ভারতবর্ষে এসেছে সম্পূর্ণভাবে আধুনিকযুগে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির হাত ধরে। তাই অনেকের মতে যেহেতু ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিরহ বা বিচ্ছেদের কোন স্থান নেই সেজন্য বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্পর্ক বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে শেষ করেন নি। আসলে ভাবসম্মেলন হল বৈষ্ণব পদাবলীর উপসংহার। তাই বাস্তবজগতে যখন রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটেনি, তখন বৈষ্ণব কবিরা ভাবের জগতে তাদের মিলন ঘটিয়েছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে কবিরা মূলত পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার প্রভৃতি পর্যায়ের পদ রচনায় বেশি আগ্রহ দেখালেও বৈষ্ণব পদাবলীতে ভাবসম্মেলন পর্যায়ের পদের সংখ্যাও কম নয়। এই পর্যায়ের পদকর্তাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে চন্ডীদাসের নাম করতে হয়। তিনি অপরূপ ভঙ্গিমায় রাধাকৃষ্ণের ভাবের জগতে মিলন ঘটিয়েছেন। তাঁর একটি পদ হল—

''সখি হে জানি কুদিন সুদিন ভাল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল।।''

এই পর্যায়ের পদে চন্ডীদাস কৃতিত্ব দেখালেও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন বিদ্যাপতি। তাঁর একটি পদে রাধা কৃষ্ণকে নিজের ভাবের জগতে আবিস্কার করে সকল দ্বিধা সংশয় থেকে মুক্ত হয়েছেন। পরম সত্যকে উপলব্ধি করে তার জীবন উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই তিনি বলেছেন—

''আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা।।''

বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণকে নিজের ভাবের জগতে আবিস্কার করে এতই আনন্দিত হয়েছেন যে, সেই আনন্দকে নিজের দেহে ধরে রাখতে পারছেন না। তিনি উচ্চকিত কণ্ঠ্যে এই আনন্দকে জগৎবাসীর কাছে জ্ঞাপন করে বলেছেন—

''আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইলুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দ্বা।।''

বিদ্যাপতির রাধার কাছে এখন বিশ্বপ্রকৃতি মিলনের অনুকূল হয়ে উঠেছে। এখন আর ডাহুকির ডাক শুনে তার বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার মত অবস্থা নেই। তার হৃদয়ে চির বসন্ত বিরাজ করছে—

''সই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকই
লাখ উদয় করি চন্দা।
পাঁচবান অব লাখ বান হওই
মলয় পবন বহু মন্দা।।''

বিদ্যাপতির রাধার আনন্দের এই উতরোল সঙ্গীত মানব হৃদয়ের চিরকালীন কাব্যময়তার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— ''দুঃখ আনন্দের বিপরীত নয়, সুখ দুঃখ মিলিয়েই আনন্দের পূর্ণতা।'' রবীন্দ্রনাথের এই কথা হয়ত তাঁর বহু পূর্বের কবি বিদ্যাপতি বুঝেছিলেন। তাই অনেক দুঃখ পাবার পর ভাবের জগতে কৃষ্ণকে আবিস্কার করে বিদ্যাপতির রাধা বলেছেন—

''কি কহব রে সখী আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দির মোর।।''

বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস ছাড়াও আরও অনেক কবি ভাবসম্মেলন পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি যেভাবে রাধার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করেছেন তা অন্য কোন কবির দ্বারা সম্ভব হয়নি। তাই এই পর্যায়ের পদ রচনায় বিদ্যাপতি হলেন অবিসংবাদী সম্রাট।

বৈষ্ণব পদাবলীর পঞ্চরস

ভারতীয় সাহিত্যতত্বে বিভিন্ন প্রকার ভাব ও রস সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও বৈষ্ণব শাস্ত্রে রসের বিভাগ সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে 'সাহিত্যদর্পণ'-এ নির্দেশিত নয়টি রসের সাথে 'ভক্তিরস' নামে একটি রস যোগ করা হয়েছে। তবে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে রসের পাঁচটি বিভাগ করা হয়েছে। এগুলি হল— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বৈষ্ণব পদাবলীকে এই পাঁচটি রসপর্যায়ে ভাগ করা হলেও সব রসের মূলে আছে একটিমাত্র রস, সেটি হল ভক্তিরস। এই ভক্তিরসের প্রেরণাতেই অন্য সব রসের স্ফূর্তি।

বৈষ্ণব পদাবলীতে ভক্তিরস স্ফূর্তিলাভ করেছে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। শ্রীকৃষ্ণই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একমাত্র ঈশ্বর। বৈষ্ণব মাত্রই কৃষ্ণভক্ত। তারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণকে ভজন পূজন করেন নিজ নিজ মানসিক

প্রবণতা অনুযায়ী। কেউ কৃষ্ণকে ভাবেন সখা, কেউ ভাবেন সন্তান, কেউ ভাবেন স্বামী। কৃষ্ণের এই ভজন বৈচিত্র্য অবলম্বন করেই বৈষ্ণব পদাবলীতে পঞ্চরসের বিকাশ ঘটেছে।

শান্তরস:

অমিত তেজ সম্পন্ন ও অসীম ঐশ্বর্যশালী পুরুষের প্রতি স্বাভাবিকভাবে ভয়, ভক্তি ও প্রীতি জন্মে। এই ভয় ভক্তি ও প্রীতিবশত তার চরণে নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করা হয়। বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীকৃষ্ণ অমিত তেজ সম্পন্ন এবং ঐশ্বর্যশালী পুরুষ— তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তার চরণে আত্মসমর্পনই হল শান্তভাবের আরাধনা। যেমন বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণকে 'জগন্নাথ', 'ভবতাড়ন', 'দীনবন্ধু', 'আদি-আন্তহীন ব্রহ্মান্ড পতি' জানতে পেরে তাঁর চরণে আত্মসমর্পন করেছেন—

''মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পীলু
দয়া যেন ছোড়বি মোয়।।''

বিদ্যাপতি এই আত্মসমর্পনের মাধ্যমে শান্তরসের সৃষ্টি করেছেন। শান্তরসে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে বিস্তর দূরত্ব থাকে।

দাস্যরস:

ভক্ত বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকে অমিত ঐশ্বর্যশালী প্রভু ভেবে নিজেদের তার দাস বলে মনে করে সেবার মধ্য দিয়ে আরাধনা করেন। ভক্তের এই সেবার ফলে ঈশ্বরের সাথে তার প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একেই দাস্যরস বলা হয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে দাস্যরসের খুব বেশি পদ রচিত হয়নি। কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দাসভাবে কৃষ্ণ আরাধনার পদ্ধতি প্রচলিত নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান রূপে গ্রহণ করলেও তাকে পরমাত্মীয় বলে জ্ঞান করে। শান্তরসে শুধু নিষ্ঠা থাকলেও দাস্যরসে এসে এরসাথে সেবা যুক্ত হয়।

সখ্যরস:

বৈষ্ণব সাধনায় ভক্ত ও ভগবানের প্রীতি সম্পর্কের উপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শান্তরসে ভক্ত-ভগবানের সম্পর্কের মধ্যে ভক্তের নিষ্ঠার মাধ্যমে সমর্পনের সম্পর্ক ছিল, আর দাস্যরসে ছিল ভক্তের নিষ্ঠা ও সেবার মাধ্যমে প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক। কিন্তু সখ্যরসে এসে ভক্তের সাথে ভগবানের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানে ভক্ত শুধু সমর্পন বা সেবায় নয়, ভগবানের সঙ্গে পারস্পরিক অসঙ্কোচের বিশ্বাসও গড়ে তোলেন— সখাগণ নানাভাবে কৃষ্ণসেবা করে আনন্দলাভ করে, কৃষ্ণও ঠিক অনুরূপভাবে তার প্রতিদান দেন। উদ্ভব দাস, বলরাম দাস, যাদবেন্দ্র, বাসুদেব ঘোষ, জ্ঞানদাস প্রমুখেরা সখ্যরসের সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করেছেন। যেমন—

''কানাই হারিল আজু বিনোদ খেলায়।
সুবলে করিয়া কণ্ঠে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশী বটতলে লইয়া যায়।।''

—বলরাম দাস।

সখ্যরসে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবার সাথে প্রীতি এসে যুক্ত হয়।

বাৎসল্যরস:

ঈশ্বরকে পিতা বা পরমপিতা রূপে পূজা করবার রীতি বিশ্বের অধিকাংশ ধর্মসাধনায় প্রচলিত। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম সাধনে ঈশ্বরকে পিতা না বলে পুত্র হিসাবে পূজা করা হয়। এই পূজাকে বলা হয় সন্তান ভাবের পূজা। এখানে বৈষ্ণব ভক্তগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্তান হিসাবে কল্পনা করে তাকে হৃদয়ের ধণ হিসাবে পূজা করেন। এই সন্তান ভাবের পূজা পদ্ধতি বড় বিচিত্র। এর মধ্যে শাসন, তর্জন প্রভৃতি সব কিছুই থাকে। মাতা পিতা যেমন সময় বিশেষে সন্তানকে শাসন করেন বা তার প্রতি তর্জন করেন, বৈষ্ণব ভক্তরাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরূপ ভাব প্রকাশ করেন। ভক্ত ও ভগবানের এই সম্পর্কই পরিণতি লাভ করে বাৎসল্য রসে। জ্ঞানদাস, বাসুদেব দাস, যাদবেন্দ্র প্রমুখ কবিরা বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্যরসের সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করেছেন। যেমন—

''তোমার শপতি লাগে না ধাইও ধনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমনি।

নিকটে রাখিও ধনু সুরিয় মোহন বেনু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি।।''

বাৎসল্যরসে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের প্রীতির সাথে এসে যুক্ত হয় স্নেহ।

মধুররস:

বৈষ্ণব সাধনায় পঞ্চরসের মধ্যে মধুর রস সর্বশ্রেষ্ঠ। 'শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

''গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্যে বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে।।''

মধুররসের সাধনায় ভক্ত হন কান্তা অর্থাৎ প্রেমিকা, আর ভগবান হন কান্ত অর্থাৎ প্রেমিক। কৃষ্ণকে ভক্তগণ মনে করেন পরমপুরুষ, আর নিজেদের মনে করেন তাঁর লীলা সহচরী কান্তা। উভয়ের প্রগাঢ় প্রেম সম্পর্কের মাধ্যমে যে ভগবৎ আরাধনা তাই-ই হল মধুররসের সাধনা।

বৈষ্ণব পদাবলীতে কবিরা এই মধুর রসকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কটিকে ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক হিসাবে ধরে নিয়ে তাকে পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান, কলহান্তরিতা, প্রেমবৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাবম্মেলন প্রভৃতি পর্যায়ে বিভক্ত করে অপূর্ব সব পদ রচনা করেছেন। আর মধুর রসের আলোচনায় বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের মত উচ্চকবিত্বজ্ঞান সম্পন্ন কবি থেকে শুরু করে প্রায় সবধরণের কবিই পদ রচনা করেছেন।

মধুররসে ভক্তভগবানের সম্পর্কে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের প্রীতি এবং বাৎসল্যের স্নেহের সাথে এসে যোগ দেয় প্রেম। স্বাভাবিকভাবেই মধুররসে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের সব গুণই বজায় থাকে। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে মধুররসকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পঞ্চরসের আলোচনা বৈষ্ণব পদাবলীর মূল বলে বৈষ্ণব পদাবলীকে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের রসভাষ্য বলা হয়।